মার্কসবাদের মূল সূত্র

শংকর গুহ নিয়োগী

সমাজ চেতনা গ্রন্থমালা

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

মার্কসবাদের মূল সূত্র

শংকর গুহ নিয়োগী

সমাজ চেতনা গ্রন্থমালা
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

প্রকাশ কাল : ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬

প্রকাশক :
ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
সভাপতি
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ
এইচ.এ. ৪৪ সল্ট লেক সেক্টর-৩
কলকাতা - ৭০০ ০৯৭
দূরভাষ - ২৩২১৭৩৮১

মুদ্রক :
প্রজ্ঞা প্রকাশনী
৮ নরসিংহ লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সহায়তা মূল্য : ৮ টাকা

প্রকাশকের কথা

আজ শ্রমিক নেতা শংকর গুহ নিয়োগীর পঞ্চদশ শহীদ দিবস। শ্রমিক আন্দোলনে সাথী নিয়োগী ছিলেন নতুন পথের দিশারী, বোনাস-বেতন বৃদ্ধি-চার্জশিটের জবাব লেখার চক্রব্যূহ থেকে বার হয়ে নিয়োগী যে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ-নেশাবন্দী-নারীমুক্তি-নিপীড়িত জাতি-সত্ত্বার মুক্তি ইত্যাদি শ্রমিক জীবনের সবক'টা বিষয়ই ছিল সেই আন্দোলনের কর্মসূচীতে।

১৯৯১-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর ভিলাই শ্রমিক আন্দোলন চলাকালীন কারখানা মালিকদের ভাড়াটে ঘাতকের গুলিতে শহীদ হন শংকর গুহ নিয়োগী। আমরা, যাদের কেউ ছিলাম নিয়োগীর সহযোদ্ধা, যারা নিয়োগীর দেখানো পথে গত এগারো বছর পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছি, নিয়োগীর পঞ্চদশ শহীদ দিবস পালন করতে চলেছি তাঁর একটা মূল্যবান লেখা পুনঃপ্রকাশের মাধ্যমে। ''মার্কসবাদের মূল সূত্র'' নিয়োগীর মৌলিক রচনা নয়, সত্তরের দশকের জনপ্রিয় এক পুস্তিকা, বিপ্লবী নেতা সাধন সরকারের ''নকশালবাড়ির কষ্টি পাথরে মার্কসবাদী কারা?' অবলম্বনে ছত্তিশগড়ের উপযোগী করে নিয়োগী এই পুস্তিকা লেখেন শ্রমিকদের রাজনীতি সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে।

আমরা মূলত স্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত না হলে স্বাস্থ্য আন্দোলন সফলতা লাভ করতে পারে না। আমরা নিজেরা সমাজসচেতন, রাজনীতিসচেতন হতে চাই, স্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী বাহিনীকে সমাজসচেতন, রাজনীতিসচেতন করে তুলতে চাই। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা 'মার্কসবাদের মূল সূত্র' পুনঃপ্রকাশ করছি। 'মার্কসবাদের মূল সূত্র' আমাদের পরিকল্পিত 'সমাজ চেতনা গ্রন্থমালা'র প্রথম প্রকাশনা। ডাক্তারী ছাত্র-ছাত্রী, স্বাস্থ্যকর্মীরা আমাদের প্রকাশনার মূল লক্ষ্য হলেও সাধারণ ভাবে তা শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নিয়োগীর রচনাকে সম্পাদনা করেছেন সারা ভারত কৃষক মজদুর সভার পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সম্পাদক প্রদীপ সিংহ ঠাকুর। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ
এইচ.এ. ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯৭
শহীদ দিবস, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬

ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
সভাপতি

দু'টি কথা

মাকর্সবাদ এক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আধারিত হয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থাকে 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী' নিয়ম দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন সমাজব্যবস্থা কল্পনা করে। এই কল্পনা শরতের আকাশে ভ্রাম্যমান সাদা মেঘের মতো দিশাহীন অথবা আপন স্রোতে উথাল পাথাল বিশৃংখল এক কল্পনাবিলাস নয়। এ এমন এক কল্পনা, যাকে পাথেয় করে কোটি কোটি মানুষ কন্টকাকীর্ণ পথে চলতে চলতে শরীর রক্তসিক্ত করে তোলেন এবং সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে আপন স্বপ্নসৌধ গড়ে তোলেন।

এই কল্পনা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কল্পনা। এই কল্পনা শীতের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে আষাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর কল্পনা, যা দক্ষিণ সাগরের কোল থেকে উৎপন্ন হবে এবং একদিন যার কালো বিশাল রূপ এই বিরাট ভারতভূমিতে এক জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের উদ্দীপনার সাথে, রূপান্তরের এক নতুন আবেশ সৃষ্টি করবে।

অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমহর্ষক শিল্পবিপ্লবের দিনগুলোতে যে সমস্ত মহান বিজ্ঞানীরা আকস্মিক ঘটনা থেকে নতুন আবিষ্কারের তত্ত্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নতুন চিন্তাভাবনা খুঁজে বার করেছিলেন, কার্ল মার্কস ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। কার্ল মার্কসের মার্কসবাদ পরিবর্তনশীল দুনিয়ার অসীম সীমারেখায় এক সুদূরকালের জন্য দিশা নির্দেশক হিসাবে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

মার্কসবাদ পুঁজিবাদের জন্মলগ্ন থেকে তাকে বিশ্লেষণ শুরু করেছে, এমন নয়। বরং মার্কসবাদের দূরবীক্ষণ দৃষ্টি সামন্তবাদ এবং তারও আগে মানবসভ্যতার আদিকাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। আবার পুঁজিবাদী বিকাশের ধারাকে অনুধাবন করে বিকাশের ভবিষ্যৎ নিয়মকে অনুমান করতে পেরেছিল, যেমনভাবে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে অনুসরণ ক'রে আমরা ধ্রুব নক্ষত্রে পৌঁছে যাই। এই অনুমান সামাজিক নেতৃত্বের হৃদয়ে ভবিষ্যৎ সমাজের স্বপ্ন হয়ে তার মানবিক সত্ত্বাকে বারবার অনুপ্রাণিত করবে, যাতে সে মার্কসবাদের ভিত্তিতে এক নতুন সুখশান্তিময় সমাজের জন্ম দিতে পারে।

এপ্রিল, ১৯৯১ শংকর গুহ নিয়োগী

মার্কসবাদের মূল সূত্র

দেশে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শ্লোগান-দেওয়া পার্টির অভাব নেই। প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই বলে যে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থাই তাদের লক্ষ্য। এদের মধ্যে অনেক দলই আবার এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী চলছে বলে দাবি করে। যদি লক্ষ্য, চিন্তাধারা বা পথ একই হবে, তাহলে আলাদা আলাদা পার্টি কেন? সাধারণ মানুষ এ কথা বুঝে উঠতে পারেন না। আর বোঝবার পদ্ধতিও জানা নেই বলে তাঁরা বিরক্ত হন, বিভ্রান্ত হন, অবশেষে চুপ করে যান।

কিন্তু চুপচাপ থাকলে তো সমস্যা মিটবে না। দিনের পর দিন অনাহার-মৃত্যু বাড়ছে, বেকার বাহিনীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁওয়া হয়ে উঠেছে। কি করবো? ভাবতেই হয় সঠিক রাস্তা কোনটা? মুক্তি কোন পথে আসবে?

কিন্তু সঠিক রাস্তা খুঁজে বের করার উপায় কি?

ধরা যাক একটা নারকেল আছে। আপনি নারকেলটা হাতে নিয়ে দেখলেন, আপনার মনে হলো ওটার ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম হবে। আপনার স্ত্রী দেখলেন, তাঁর মনে হলো ২৫০ গ্রাম হবে। আপনার ভাইয়ের মনে হলো ২৭৫ গ্রাম। আপনার এক বন্ধু বললো, 'না-না, ৩২৫ গ্রাম হবে'। কে সঠিক কথা বলছেন? কিভাবে তা জানা যাবে? দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করা হলো — নারকেলের ওজন দেখা গেল ২০০ গ্রাম।

দাঁড়িপাল্লার ব্যবহারই হচ্ছে ওজন করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

এই কথা সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঠিক আর ভুল, সত্যি আর মিথ্যাকে পার্থক্য করার জন্যে এখানেও এক দাঁড়িপাল্লা বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। সেই দাঁড়িপাল্লা হলো — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

দুনিয়ায় বহু ঘটনা ঘটে চলেছে এবং ঘটতে থাকবে। এই ঘটনাগুলোকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি না, ফলে হতাশ হই। যদি আমাদের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দাঁড়িপাল্লা থাকে, আমরা হতাশ তো হবই না, বরং সমাধানের পথও বেরিয়ে আসবে।

আপনি বলবেন, দেশে এতো সব বড়ো বড়ো নেতা আছেন, তাঁদের কি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জানা নেই? জানা আছে কি নেই সেটাও জানা যাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দাঁড়িপাল্লাতেই।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বুঝতে হলে আমাদের দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বুঝতে হবে। মার্কসবাদের তিনটে অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

বস্তু কি? যাকে আমরা দেখতে পারি, ছুঁতে পারি বা অনুভব করতে পারি, তাই বস্তু। অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে সেই-ই বস্তু।

মার্কসবাদী বস্তুবাদীদের সিদ্ধান্ত হলো বস্তু থেকেই চিন্তার জন্ম। ভাববাদীদের চিন্তা এর বিপরীত। তারা বলে যে, চিন্তা থেকেই বস্তুর জন্ম।

হাওয়াই জাহাজের উৎপত্তির ব্যাপারটা দেখা যাক। ভাববাদী লোকেরা (পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী চিন্তাধারার লোকেরা) বলে যে, প্রথমে মানুষ হাওয়াই জাহাজ তৈরির কথা ভেবেছে, তারপরই হাওয়াই জাহাজ তৈরি হয়েছে। মার্কসবাদীরা প্রশ্ন করে, 'হাওয়াই জাহাজ কেন বানানো হলো? ওড়ার জন্যই তো? তাহলে ওড়ার চিন্তা কোথা থেকে এল?' মানুষ রোজ দেখে — আকাশে মেঘ ওড়ে, হাওয়ায় পাতা ওড়ে, পাখীরা ওড়ে। এসব দেখেই তারও ওড়ার ইচ্ছা হলো। তারপর হাজারো প্রচেষ্টার ফলে জন্ম নিল হাওয়াই জাহাজ।

কিন্তু এইটুকু বললেই কি ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের কথা মেনে নেবে? না ভাই, ওরা এতো তাড়াতাড়ি মানবে না।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, 'ভাই, কাক কেমন দেখতে?' আপনি হেসে বলবেন, 'আরে, এটা কোনো প্রশ্ন হলো?' কিন্তু যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, 'বলুন তো, আমেরিকার নাইটিঙ্গল পাখি দেখতে কেমন?' আপনি বলতেই পারবেন না। কারণ, ঐ পাখী আপনি দেখেননি। এরকম অনেক উদাহরণ দিয়েই বলা যায় যে, বস্তুই চিন্তার ভিত্তি।

মনে করুন, আপনি কোনও ভালো কাজ করে আসছেন — হৃদয় খুশিতে আর মন আশায় ভরপুর। হঠাৎ আপনার সামনে একজন বাচ্চা গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেল। এই ঘটনা দেখার পরও কি আপনার মনে খুশির ভাব থাকবে? থাকতেই পারে না। এরকম কেন? বাচ্চা চাপা পড়ে মরার আগে খুশি, আর চাপা পড়ে মরার পরে দুঃখ কেন হলো? বস্তুই আপনার মনের ভাবনাকে পরিবর্তন করলো। ভাববাদীরা এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে স্বীকার করে না।

কার্ল মার্কসের আগেও বস্তুবাদী লোকেরা ছিলেন। কিন্তু কার্ল মার্কসই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'বস্তুই চিন্তার ভিত্তি' এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলা হয়।

মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের বস্তুবাদের আলোচনার সময় সাধারণভাবে দার্শনিক ফুয়েরবাখের উল্লেখ করেন, যিনি বস্তুবাদকে তার নিজস্ব অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন। তার অর্থ কোনভাবেই এই নয় যে, মার্কস-এঙ্গেলস-এর বস্তুবাদ আর ফয়েরবাখের বস্তুবাদ এক ও অভিন্ন। মার্কস-এঙ্গেলস ফয়েরবাখের বস্তুবাদের 'ভেতরের শাঁস'-কে গ্রহণ করেছেন আর বর্জন করেছেন তার ভাববাদী এবং ধর্মীয় খোসা। এভাবে মার্কস এঙ্গেলস বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক দার্শনিক তত্ত্বে বিকাশ ঘটিয়েছেন।

একভাবে মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের দ্বন্দ্বতত্বের আলোচনার সময় সাধারণভাবে দার্শনিক হেগেল-এর উল্লেখ করেন, যিনি দ্বন্দ্বতত্বের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহকে সূত্রায়িত করেছিলেন। তার অর্থ কোন ভাবেই এই নয় যে, মার্কস-এঙ্গেলস-এর দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। মার্কস-এঙ্গেলস হেগেলের দ্বন্দ্বতত্বের ভেতরের শাঁসকে গ্রহণ করেছেন আর বর্জন করেছেন তার ভাববাদী খোলসকে। এভাবে মার্কস-এঙ্গেলস দ্বন্দ্বতত্বের আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে বিকাশ ঘটিয়েছেন।

বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ অনুযায়ী, সমাজের পরিবর্তন ঘটে প্রধানত সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলে অর্থাৎ উৎপাদ শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলে, এই দ্বন্দ্বগুলোর বিকাশই সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয় এবং নতুন কর্তৃক পুরাতন সমাজকে ধ্বংসের জন্য প্রেরণা দেয়। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ কি বাহ্যিক কারণকে বাতিল করে? মোটেই না। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতে বাহ্যিক কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের শর্ত, আর আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি, আভ্যন্তরীণ কারণের মাধ্যমে বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়।

উদাহরণ হিসাবে একটা মুরগীর ডিম নেওয়া যাক। ডিমের ভেতরের সংগ্রামের কারণে তা থেকে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা হতে গেলে বাইরের উত্তাপও প্রয়োজন। একটুকরো সাদা পাথরের ওপর উত্তাপ দিলে তা থেকে মুরগীর বাচ্চা বেরোবে না। একইভাবে শুধু ডিম থাকলেই বাচ্চা হবে না, যতক্ষণ না তাকে তাপ দেওয়া হচ্ছে।

যার অস্তিত্ব আছে, তাই-ই-বস্তু। তাহলে কাদামাটিও বস্তু। তাকে আপনি চটকাতে পারেন, হাতের জোরে চূর্ণবিচূর্ণও করতে পারেন। সেই কাদামাটি আপনি ইঁটের ছাঁচে ঢালাই করে গোটা দিন রোদ্দুরে শুকিয়ে নিন। সন্ধ্যাবেলায় যদি আপনাকে ওটা ভাঙতে বলা যায় তো সকালের চেয়ে অনেক বেশি জোর লাগিয়েই আপনি ওটা ভাঙতে পারবেন। কারণ গোটা দিন রোদ আর মাটির সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক নিয়মে কাদামাটি অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করে শুকনো মাটিতে পরিণত হয়েছে। আবার ঐ শুকনো মাটিকে সারারাত কয়লার আগুনে পোড়ালে আগুন আর শুকনো মাটির লড়াইতে মাটি আরও শক্তিশালী হয়ে পাকা ইট তৈরি হবে। ঐ ইঁটকে ভাঙতে চেষ্টা করলে, খালি হাতে সম্ভবত পারবেন না। কাদামাটি থেকে

শুকনো মাটি আর শুকনো মাটি থেকে পাকা ইঁট তৈরি হবার গুণ মাটির মধ্যেই ছিল। কিন্তু রোদ এবং আগুনের সাথে দ্বন্দ্ব ঐ গুণকে বিকশিত করেছে।

জন্মের সময় আমাদের কারও ওজন ৩-৪ কিলোগ্রামের বেশি ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের ওজন ৪০ থেকে ৬০ কিলোগ্রাম। এটা কেমন করে সম্ভব হয়? জন্মের সাথে সাথেই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়, আমরা হাত-পা নাড়তে থাকি। আমরা ক্লান্ত হই, ক্ষিদে পায়। খাবার খাই, কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ি। আমাদের ভেতরের এবং বাইরের সংগ্রাম চলতে থাকে, আমাদের রূপান্তর ঘটতে থাকে— বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে। যতদিন পর্যন্ত আমরা দ্বন্দ্ব অর্থাৎ লড়াই করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকি। যখন আমরা আর লড়াই করতে পারব না, আমাদের মৃত্যু ঘটবে। অর্থাৎ জীবিত মানুষ মৃত মানুষে রূপান্তরিত হবে।

আরও কিছু সোজা উদাহরণ দেখা যাক। আপনার হাতের চামড়া এবং পায়ের চামড়ায় কিছু ফারাক আছে কিনা? পায়ের চামড়া হাতের চামড়ার চেয়ে একটু মোটা হয় কারণ তাকে অনবরত মাটির সাথে, জুতোর সাথে সংগ্রাম করতে হয়। কলম চালানো বাবু আর কোদাল চালানো শ্রমিকের হাতের তফাৎ হয় কি না? হতেই হবে। এইভাবে আমাদের দাড়ির চুল এবং মাথার চুলের মধ্যেও পার্থক্য হয়। দাড়ির চুল ব্লেড বা ক্ষুরের সাথে রোজ রোজ লড়াই করে শক্তিশালী অর্থাৎ মোটা হয়। এই সমস্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে বিকাশের আসল গুণ মাংস, চামড়া বা চুলেরই মধ্যেই ছিল। কিন্তু বাইরের দ্বন্দ্ব ভেতরের দ্বন্দ্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বিকাশে সহায়তা করেছে।

তাহলে আলোচনা থেকে পাওয়া গেল যে, বিকাশকে বুঝতে হলে আমাদের দুধরনের দ্বন্দ্বকেই প্রয়োজন মতো গুরুত্ব দিতে হবে। দু ধরনের লড়াইকে এক করে ফেলার ভুল করলে চলবে না। বস্তুবাদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এটাই মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

এই শিক্ষাকে কেউ মানে, কেউ মানে না। যে মার্কসবাদকে মানে না, তার হাত আর পায়ের চামড়ার মধ্যে কি পার্থক্য হবে না? মাথার চুল আর দাড়ির চুলে কি পার্থক্য হবে না? নিশ্চয় হবে। কারো মানা বা না-মানার ওপর বিজ্ঞান নির্ভর করে না। কারো মানা বা না-মানাতে সত্যের কোনও হেরফের হয় না।

আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাই মার্কসের শিক্ষাকে মানেন না। তাঁরা বলেন যে, মার্কসবাদ বিদেশী চিন্তাধারা, আমাদের দেশে তা কার্যকর নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের কোন দেশ হয় না। বৈজ্ঞানিক সত্য সব দেশেই প্রযোজ্য।

আসুন আমরা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করি।

আমরা যে সমাজব্যবস্থায় বাস করছি, তা বস্তু, কারণ তার অস্তিত্ব আছে। এই সমাজে ব্যবস্থা আর অব্যবস্থা, দুই-ই আছে। যার জন্য আমরা রোজই সংগ্রাম করছি। বর্তমান সমাজব্যবস্থার ভিত্তিই হলো শোষণ। এই জন্য এই সমাজব্যবস্থাকে শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বলে। এই সমাজের উপাদান কি? এখানে মূলত দুটো শ্রেণী আছে। একটা হলো শোষক শ্রেণী, যাদের সংখ্যা খুব কম। এবং অন্যটা হলো শোষিত শ্রেণী, যাদের সংখ্যা খুব বেশি। বর্তমান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি? মুনাফা। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে মুনাফা সংগ্রহ করে। শোষিত শ্রেণী নিজেদের ঘাম রক্ত দিয়ে উৎপাদন করে। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণের ওপর তাদের কোনো অধিকার নেই। শোষকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের মালিক। তারা নিজেরা মেহনত করে না। মেহনতকারী জনতা যে জিনিষ উৎপন্ন করে তা থেকে মুনাফা সংগ্রহ করার অধিকারী এই শোষকশ্রেণী। এরা মেহনতকারীদের মজুরি দেওয়ার অধিকারী।

শোষিতশ্রেণী যদি কঠোর পরিশ্রম না করে তাহলে ধান, গম, কয়লা, লোহা প্রভৃতি কোনও জিনিষই উৎপন্ন হবে না, এদের মূল্যও তৈরি হবে না, মালিকদেরও মুনাফা সংগ্রহ বা মজুরি দেওয়ার অধিকার থাকবে না। শোষকশ্রেণী (লুণ্ঠনকারী শ্রেণী) প্রতিদিন শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীকে জোঁকের মতো শোষণ করছে। শোষক এবং শোষিত এই দুই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংগ্রামই সমাজকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সমাজে শোষক এবং শোষিত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কি? আপনি এবং আপনার কারখানার মালিক দুজনেই প্যান্ট পরেন এবং কোমরে বেল্ট বাঁধেন। এই দুই বেল্টের মধ্যে সম্পর্কটা কি? আপনার মালিকের বেল্টের ঘর প্রতি বছর বাড়তে থাকবে, কারণ প্রতি বছরই আপনার মালিকের পেট মোটা হতে থাকবে। আর আপনার বেল্টের ঘর কম হতেই থাকবে, কেন না প্রতি বছরই অনাহারে আপনার পেট কমতেই থাকবে। একের অবস্থা অন্যের ঠিক বিপরীত।

কার্ল মার্কস আমাদের শিক্ষা দেন যে, শোষণভিত্তিক সমাজে দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণী থাকে। একে অন্যের বিরোধী হবার ফলে দুই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য। শ্রেণী সংগ্রাম এক সময় বিপ্লবে পর্যবসিত হয়, এক শ্রেণীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। বর্তমান সময়ে অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তায় চলতে চলতে একসময় লুণ্ঠনকারী শ্রেণীকে হঠিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে। সমাজকে পাল্টে দেবে এক শোষণহীন সমাজে অর্থাৎ এক অসীম সুখ-শান্তিময় সমাজ বানাবে। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অর্থ

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। শ্রমিকশ্রেণী যদি দৃঢ় নিশ্চিতভাবে তাদের একনায়কত্ব চালিয়ে যেতে পারে তবেই শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে। মার্কসের এই শিক্ষাকে যাঁরা মানেন তাঁদেরই মার্কসবাদী বলে।

বর্তমান সমাজ শ্রেণীবিভক্ত, মূলত দুটো শ্রেণীতে, শোষক এবং শোষিত। এই দুই শ্রেণী পরস্পরবিরোধী বলে দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য। শ্রেণীসংগ্রামে বলপ্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু বলপ্রয়োগের জন্য দায়ী কে?

শোষকশ্রেণী নিজেদের শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার (আইন, আদালত, পুলিশ, মিলিটারী, ইত্যাদির) সাহায্য নেয়, অন্যশ্রেণীর ওপর দমন পীড়ন চালায়। যখন শোষকশ্রেণী হিংসা বা অত্যাচার চালায়, তখন শোষিত মানুষের পক্ষে নিজেকে বাঁচানোর জন্য বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

১৯৬৭ সালের ২০শে জুন ভিলাই ইস্পাত কারখানায় এক সিকিউরিটি জওয়ান বিনা কারণে এক শ্রমিককে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলে। ৪০ হাজার শ্রমিক জড়ো হয়ে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে কৈফিয়ৎ চান। শ্রমিকদের ওপর ভয়ংকরভাবে লাঠিচার্জ করা হয়। ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা দুএকটা বাস জ্বালিয়ে দেন। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে?

রায়পুরের ছাত্ররা তাদের ১৭ দফা দাবী নিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিল বার করেছিল। আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য পুলিশ ভয়ংকর অত্যাচার চালায়। মারপিট, লুঠপাট ছাড়াও তারা ঘরে-ঘরে ঢুকে মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এর জবাবে নাগরিকরা কি চুপ করে বসে থাকবে?

অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনতার হিংসা, দমন পীড়নের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ তো অস্বাভাবিক নয়। যতদিন এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে দমিয়ে রাখবে, ততদিন শ্রেণীসংগ্রামের প্রচলিত নিয়মেই এগুলো ঘটতে থাকবে। আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ ছাড়া কোনো ঘটনাই ঘটে না আর শোষণই জনতার হিংসাত্মক কার্যকলাপের মূল কারণ। যারা শোষণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে তারাই এসবের জন্য দায়ী।

মার্কসবাদের বিরোধীরা বলে, মার্কসবাদ বিদেশী চিন্তাধারা। তা ভারতে প্রযোজ্য নয়।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদের জীবন আছে। জগদীশচন্দ্র বসু তো ভারতীয় ছিলেন। তাই বলে কি এই সত্য রুশ, জার্মান, চীন প্রভৃতি দেশে প্রযোজ্য হবে না? চীনদেশে কাগজের

আবিষ্কার হয়েছিল বলে কি আমরা কাগজে লিখব না? মার্কসবাদীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুং চিন্তাধারাকে মানে, কারণ তা সমাজ-বৈজ্ঞানিক সত্য।

উদাহরণ স্বরূপ ভারতের এক নম্বর দালাল পুঁজিপতি বিড়লা ও তার কারখানায় কর্মরত হাজার-হাজার শ্রমিকের কথা ধরা যাক। এরা দুটো আলাদা শ্রেণীভুক্ত, বিড়লা শোষকশ্রেণীর আর শ্রমিক শোষিতশ্রেণীর। পুঁজিবাদী সমাজে অবশ্যই দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে। দ্বন্দ্বমূলক নিয়ম অর্থাৎ সংগ্রামের নিয়ম অনুযায়ী এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য। কার্ল মার্কসের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যাঁরা চলেন, তাঁরা জানেন যে একদিন শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীকে সরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে, অর্থাৎ শ্রমিকদের রাজ গড়ে উঠবে, সমাজতন্ত্র বিকশিত হবে। আমাদের দেশের কিছু নেতা বলে থাকেন অহিংসা পরম ধর্ম। কিন্তু সমাজে দুই বিরোধী শ্রেণীর অস্তিত্বই ক্রমাগত হিংসার জন্ম দেয়। জনতাকে 'অহিংস' হবার পরামর্শ দেওয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তা নয়। যতদিন পুঁজিপতিদের অন্যায় হিংসা থাকবে, ততদিন জনতা এই পরামর্শ শুনবে না।

লেনিন আমাদের শিক্ষা দেন যে, জনতা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রতিটা শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক পার্টি দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনও পার্টি বা তার নেতা শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। অমুক নেতা ভালো বা তুমুক নেতা খারাপ, মার্কসবাদীরা এভাবে চিন্তাভাবনা করে না। মার্কসবাদীরা পার্টি ও নেতাদের বিচার করে তাদের কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে; তাদের ঘোষণা দিয়ে নয়, নানান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তারা কী করছে, তা দিয়ে। আমাদের উচিত শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর নেতাদের মান্য করা এবং অন্যান্য শ্রেণীর নেতাদের বিরোধিতা করা। আমাদের দেশে শোষকশ্রেণী ৫ শতাংশ এবং শোষিতশ্রেণী ৯৫ শতাংশ। শতকরা ৫ ভাগ লোক এই সমাজকে টিকিয়ে রাখতে চায় আর ৯৫ ভাগ লোক এই সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়। শতকরা ৫ ভাগ লোকের সাথে ৯৫ ভাগ লোকের লড়াই। তবুও শতকরা ৫ ভাগ লোক অর্থাৎ সামন্তবাদ ও বড় পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজত্ব চলছে। কেমন করে?

মনে করুন আপনাদের মহল্লায় এক রোগা পটকা ছেলে থাকে। দারা সিং-এর সাথে তার প্রতিযোগিতা হবে। দারা সিং ভাববে— 'আরে, এ আমার সাথে কি লড়বে? আমি তো একে তুলেই ফেলে দেবো!' কিন্তু যদি ঐ রোগা পটকা ছেলেটা দারা সিং-এর দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎই একটা পিস্তল বার করে তো কি হবে? দারা সিং যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ভয় পেয়ে যাবে। কেন? কারণ এখন লড়াইটা হবে দারা সিং-এর সাথে ঐ রোগা পটকা ছেলেটা এবং

তার হাতিয়ারের। বর্তমান পরিস্থিতি এইরকমই। পুঁজিপতিশ্রেণী পিস্তলের জোরে শ্রমিকশ্রেণীকে দমিয়ে রেখেছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর অস্ত্র কি? রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থাৎ প্রশাসন, পুলিশ-মিলিটারী, আদালত, জেল ইত্যাদি। শতকরা ৫ ভাগ লোক এবং তাদের শাসনই ৯৫ ভাগ জনতাকে লুণ্ঠন করছে। শোষণভিত্তিক সমাজে শাসন অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র শোষণ-ভিত্তিক সমাজকাঠামোকে রক্ষা করে। তা কখনো শোষিতশ্রেণীর মঙ্গলের জন্য হতে পারে না। যতদিন শোষণ থাকবে ততদিন রাষ্ট্রযন্ত্র শোষকশ্রেণীর হাতেই থাকবে।

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট নামধারী কিছু গোষ্ঠীর (সি পি এম, সি পি আই, এ আই সি পি, এম সি পি আই) মধ্যে কেউ বলে যে, আজকের নতুন পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামের, বিপ্লবের প্রয়োজন নেই, শান্তিপূর্ণ পথে, ভোটের পথেই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। সি পি এম-সি পি আইরা একথাগুলো এতো সোজাসাপটা বলে না। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তারাও ঐ একই পথের পথিক।

পরিস্থিতি তো রোজ বদলাচ্ছে, বদলাবেও। তার জন্য কি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও বদলাবে? বাচ্চার জন্ম হবে অথচ মায়ের প্রসব যন্ত্রণা হবে না? প্রসবের সময় রক্তপাত হবে না? লুণ্ঠনকারী শোষকশ্রেণী থাকবে অথচ লুঠপাট হবে না? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঘের হৃদয় পরিবর্তিত হবে— সে রক্তপান, মাংসভক্ষণ বন্ধ করে ঘাস খেতে শুরু করবে? কমিউনিস্ট নামধারী সংশোধনবাদীদের তত্ত্ব কী মজাদার!

যতদিন শ্রেণীসংগ্রাম মারফৎ বিপ্লব না হবে অর্থাৎ লুণ্ঠনকারী শ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিক কৃষকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে না নেবে, ততদিন শোষকশ্রেণী শোষণ চালিয়েই যাবে। সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন লুণ্ঠনকারী শ্রেণীকে উৎখাত করা। শ্রেণীসংগ্রামের পথই শোষণমুক্তির একমাত্র পথ এবং এই পথে চলতে হলে জনতার চাই মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা।